যুগান্তর

তারিখ 19 APR 2012
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

# শিক্ষায় বরাদ্দ নিয়ে বাজেট ভাবনা

কাজী ফারুক আহমেদ

অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত আগামী বাজেট নিয়ে অর্থনীতিবিদদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছেন। বলেছেন, সামনের বাজেট খুব উচ্চাভিলাষী হবে না। দুই লাখ কোটি টাকার কম হবে এবং তাতে সরকারের রাজনৈতিক অঙ্গীকারের প্রতিফলন থাকবে। ইতিমধ্যে একটি বেসরকারি সংস্থা এবং দেশের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের বিভিন্ন সংগঠনের মোর্চা, জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্ট এ মাসের ১০ তারিখে শিক্ষায় কাম্য বরাদ্দ নিয়ে এক প্রাক-বাজেট আলোচনার আয়োজন করে। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির কো-চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, সাবেক শিক্ষা উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান মোঃ আবদুল মজিদ, এডাব সভাপতি ও নারী প্রগতি সংঘের নির্বাহী পরিচালক রোকেয়া কবীর এবং বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠনের নেতারা আলোচনায় অংশ নেন। তারা অগ্রাধিকার নির্ণয় ও অপচয়ের ফাঁকফোকর বন্ধ করে শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে আগামী বাজেটে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিত করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। গতানুগতিক তথ্য-উপাত্ত পরিবেশনের প্রবণতা পরিহার করে সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রত্যাশা ও স্বার্থ সংরক্ষণকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে তৃণমূল পর্যায়ের বাস্তব পরিস্থিতি, পরিসংখ্যান মূল্যায়ন করা দরকার বলে সভায় মত প্রকাশ করা হয়। প্রসঙ্গক্রমে ধারণাপত্র উপস্থাপক জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের আলোকে গঠিত দেশের 'চাইল্ড পার্লামেন্টের' জরিপে প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরে শিক্ষায় আর্থিক ব্যবস্থাপনায় অনুসৃত নীতি পুনর্বিবেচনার সপক্ষে এডুকেশন ওয়াচের মতামতের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেন।

**চাইল্ড পার্লামেন্টের জরিপ**

এ বছর আমাদের চাইল্ড পার্লামেন্টের সদস্যরা শিক্ষা খাতে ব্যয়, পরিবার ও শিশুর ওপর প্রভাব নিয়ে দেশব্যাপী একটি জরিপ করেছে। ২৪২ জন শিশু (ছেলে ১২১ ও মেয়ে ১২১ জন) এবং ২০৩ জন অভিভাবক এতে অংশগ্রহণ করে। এ থেকে প্রাপ্ত কয়েকটি তথ্য প্রণিধানযোগ্য। এতে দেখা যায়, স্কুলে বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি ফি এবং বেতন বেশি হওয়ায় অনেক গরিব শিশুর পরিবারের পক্ষ থেকে তা সময়মতো বহন করা সম্ভব হয় না। বেসরকারি ও ব্যক্তিগত মালিকানাধীন স্কুলগুলোতে এটা অনেক বেশি। ২০১০ সালের তুলনায় ২০১১ সালে স্কুলের ভর্তি ফি বেড়েছে ২৪.৮৭ শতাংশ এবং স্কুলের বেতন বেড়েছে ৮.২৫ শতাংশ। ১১ শতাংশ শিশু বলেছে, পরিবারের অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা ও সমস্যার কারণে তারা সঠিক সময়ে স্কুলে ভর্তি হতে পারেনি। ১২ শতাংশ শিশু যথাসময়ে স্কুলের বেতন পরিশোধ করতে পারেনি। সময়মতো ভর্তি না হতে পারা এবং বেতন পরিশোধ না করার কারণে শিশুকে শিক্ষকের কাছ থেকে বকা শুনতে হয়। বেতন ও পরীক্ষার ফি না দিতে পারার কারণে কাউকে কাউকে পরীক্ষা দিতে দেয়া হয় না। ৯৩.৪ শতাংশ শিশু বলেছে, শিক্ষার উপকরণের মূল্য অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ কারণে ব্যয়বৃদ্ধির ফলে অভিভাবকরা শিক্ষা উপকরণের ব্যবহার ২০-২৫ শতাংশ পর্যন্ত কমিয়ে দিয়েছে। ১০ শতাংশ শিশু বলেছে, ব্যয়বৃদ্ধির অতিরিক্ত অর্থ তারা পরিবার থেকে পায়নি। আবার অতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহ করার জন্য কখনও কখনও শিশু শিক্ষার্থীদের অন্য শ্রমে নিয়োজিত হতে হয়েছে। অভিভাবকদের অতিরিক্ত শ্রম দিতে হয়েছে, যা ছিল কষ্টদায়ক। দেশের ৬৪টি জেলায়ই শিশু শিক্ষার্থীদের প্রাইভেট ও কোচিং পড়ার সংখ্যা বাড়ছে। ৯০.১ শতাংশ শিক্ষার্থী বলেছে, তারা কোচিং অথবা প্রাইভেটে পড়ালেখা করে। কর্মশালায় এসে অনেক শিশু বলেছে, অনেক শিশুর স্কুলে শুধু নাম আছে, কিন্তু তাদের স্কুলে যেতে হয় না। তারা সারা বছর শুধু কোচিংয়ে পড়ে। ভালো ফলাফলের আশায় অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের কষ্ট করে হলেও কোচিং অথবা প্রাইভেটে পড়ালেখা করতে পাঠাচ্ছে। এজন্য অনেক বাবা-মাকে বেশি পরিশ্রম করতে হয়। ১০ শতাংশ শিশু শিক্ষার্থী যারা কোচিং অথবা প্রাইভেটে পড়ছে না, তাদের ফলাফল খারাপ হচ্ছে। কোচিং অথবা প্রাইভেটের জন্য পরিবারের যে ব্যয় হয় তা অনেক ক্ষেত্রে পরিবারের অন্যান্য ব্যয়ের খাত থেকে সমন্বয় করতে হয়। আবার কোচিং অথবা প্রাইভেটে পড়ুয়া শিক্ষার্থীরা বলেছে, এ খাতের টাকা তারা তাদের পরিবার থেকে পায় না। ফলে ছাত্র পড়ানো, ছোট শ্রমের কাজ ইত্যাদি করে তাদের সে খরচ মেটাতে হয়। জরিপে জানা যায়, ৮৫ শতাংশ মেয়েশিশু স্কুলে যায়। অন্যদিকে ছেলেশিশু স্কুলে যায় ৭৬.৯ শতাংশ। স্কুলে না যাওয়ার কারণ হিসেবে ৬২ শতাংশ শিশুর অভিভাবক বলেছে, শুধু আর্থিক সংকটের কারণে তারা তাদের শিশুদের স্কুলে পাঠাতে পারে না। অন্যদিকে ২৫ শতাংশ শিশুর অভিভাবক বলেছে, একের অধিক সন্তান হওয়ার কারণে তারা তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে পারছে না। আবার ১৩ শতাংশ শিশুর অভিভাবক এর জন্য অন্যান্য কারণের কথা বলেছে। এতে দেখা যায়, শুধু আর্থিক সংকটের কারণে অনেক অভিভাবক তাদের শিশুদের স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিচ্ছে।

**শিক্ষায় আর্থিক ব্যবস্থাপনায় অনুসৃত নীতি**

চাইল্ড পার্লামেন্টের জরিপের সঙ্গে ২০০৭ সালের ডিসেম্বরে প্রকাশিত এডুকেশন ওয়াচ প্রতিবেদনে ক্যাম্পেইন ফর পপুলার এডুকেশন চেয়ারপারসনের লিখিত বক্তব্য যোগ করলে শিক্ষায় অনুসৃত আর্থিক ব্যবস্থাপনার নীতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এতে বলা হয়, গ্রামাঞ্চলের তুলনায় শহরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বরাদ্দ পায় বেশি। এক্ষেত্রে ছাত্রসংখ্যা নাকি ভৌগোলিক অবস্থানকে ভিত্তি ধরা হয়, তা বোধগম্য নয়। শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি অর্থসংস্থান ও বাজেট বরাদ্দে নীতিমালার বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করে নির্ধারণ করা উচিত। বলা বাহুল্য এসব কারণে দেশে গত চার দশকে শিশু ও নারী শিক্ষার বিকাশ, জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে দৃশ্যমান অগ্রগতি, ব্যাপক শিক্ষা স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি, পল্লী বিদ্যুতায়ন কর্মসূচির সম্প্রসারণ, চাকরি ও কর্মবাজারে নারীর আগের চেয়ে অধিক সংখ্যায় প্রবেশের মতো ইতিবাচক পরিবর্তন সত্ত্বেও তা জনমানুষের প্রত্যাশার আংশিক পূরণ করতে পেরেছে।

বাজেটে শিক্ষাবরাদ্দ প্রসঙ্গে আমি মনে করি, শিক্ষায় অর্থায়ন একটি উৎকৃষ্ট বিনিয়োগ। শিক্ষা সবচেয়ে উৎপাদনশীল খাত। সেজন্যই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর জাপান দ্রুত অর্থনৈতিক পুনর্বাসনে ৪৩ শতাংশ পর্যন্ত শিক্ষায় বরাদ্দ করে। আমাদের নিকটবর্তী উন্নয়নকামী অনুন্নত ও স্বল্পোন্নত দেশে আমাদের চেয়ে শিক্ষায় বরাদ্দ বেশি। নেপালে জিডিপির ৪ শতাংশ এবং জাতীয় ব্যয়ের ২০ শতাংশ, সিঙ্গাপুরে জিডিপির ৩.৭ শতাংশ এবং মোট ব্যয়ের ২৩.৪ শতাংশ, থাইল্যান্ডে জিডিপির ৪.২ শতাংশ এবং মোট ব্যয়ের ২৫ শতাংশ এবং মালয়েশিয়ায় শিক্ষায় বরাদ্দ মোট ব্যয়ের ২৯ শতাংশের মতো। এ প্রেক্ষাপট বিবেচনায় ২০১২-১৩ অর্থবছরে আমাদের শিক্ষা খাতে ১৫ শতাংশ বরাদ্দ চাওয়াটা যুক্তিসঙ্গত মনে করি।

আমরা সাধারণত জনসংখ্যাকে নেতিবাচক হিসেবে দেখতে অভ্যস্ত। কিন্তু এর সৃজনশীলতা, শিক্ষার জন্য অবদান রাখার সক্ষমতা যে আগের যে কোন সময়ের চেয়ে বেশি তাও বিবেচনায় নেয়া দরকার। দারিদ্র্য ও বিশ্বমন্দা সত্ত্বেও বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ৬৯২ ডলার। জাতীয় প্রবৃদ্ধি সরকারি হিসাবে ৬.৭ শতাংশ। বিশ্বব্যাংকের হিসাবে গড় মাথাপিছু আয় ৮৫০ ডলার হলে একটি দেশ মধ্যম আয়ের হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্য। এদেশের জনসংখ্যা একসময় ৩ কোটি ছিল। এরপর ৭ কোটি হয়েছে। এখন তা ১৫ কোটির কিছু কম বা বেশি। এ পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার জন্য জনগণের কর প্রদান অথবা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অবদান রাখার সুযোগও আগের চেয়ে অনেক বেশি। সেজন্য প্রয়োজন বাস্তবানুগ পরিকল্পনা গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন। সরকার শিক্ষার জন্য বন্ডও চালু করতে পারে। আমরা জানি, দেশে বিশেষ করে পৌর এলাকায় গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানি সংকট থাকা সত্ত্বেও মানুষ যেটুকু নাগরিক সুবিধা পায় তার বিল ঠিকই পরিশোধ করে। এ বিবেচনা থেকে ইউটিলিটি সার্ভিসের ওপর শিক্ষার জন্য এক শতাংশ কর আরোপ করা হলে কেউ আপত্তি করবে বলে মনে হয় না। তবে শর্ত হল, কর বাবদ আদায়কৃত অর্থের সদ্ব্যবহার ও যথাস্থানে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ নিশ্চিত করা। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি জোর দিতে হবে প্রকৃত সাক্ষরতা অর্জন ও প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে কর্মমুখী শিক্ষার ওপর। একই সঙ্গে প্রয়োজন— ১. জাতীয় বাজেট প্রক্রিয়ার বিকেন্দ্রীকরণ : প্রতিটি জেলার জন্য পৃথক বাজেট ও প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নিজস্ব বাজেট প্রণয়ন। ২. অবিলম্বে বেসরকারি শিক্ষক নিয়োগ কমিশন গঠন। ৩. স্থায়ী শিক্ষা কমিশনের জন্য অর্থবরাদ্দ প্রদান। ৪. শিক্ষানীতির সফল বাস্তবায়নে ও শিক্ষক নামধারী একশ্রেণীর শিক্ষক দ্বারা শিক্ষার্থীদের শারীরিক-মানসিক শাস্তি প্রদান বন্ধে যথোপযুক্ত শিক্ষক প্রশিক্ষণের ওপর অগ্রাধিকার প্রদান। ৫. বাংলাদেশ টেলিভিশনের একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা চ্যানেল চালু করা। বর্তমানে সংসদের যে চ্যানেলটি চালু আছে, সংসদ অধিবেশন যখন থাকে না, তখন তা শিক্ষা চ্যানেল হিসেবে চালু করা। বেসরকারি চ্যানেলগুলোতেও প্রতিদিন একটি নির্ধারিত সময় শিক্ষা কর্মসূচির ব্যবস্থা করা।

সবশেষে একটি কথা জোর দিয়ে বলা দরকার। বর্তমান সরকার একটি রাজনৈতিক সরকার। যার জনগণের কাছে সুনির্দিষ্ট কমিটমেন্ট আছে। সে অনুযায়ী কাজ করেই সরকারকে আবার নির্বাচনে জনগণের সমর্থন চাইতে হবে। এক্ষেত্রে আমলাদের যে অংশটি অদক্ষ ও যাদের অবস্থান জনস্বার্থের বিপরীতে, তাদের ওপর নির্ভর করলে চলবে না। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে ও শিক্ষামন্ত্রীর লাগাতার চেষ্টায় বেসরকারি শিক্ষকদের টাইম স্কেল পুনরায় চালু হয়েছে, যা দীর্ঘ পঁচিশ বছর চালু থাকার পরও বিগত চারদলীয় জোট সরকার বন্ধ করে দিয়েছিল এবং বর্তমান মহাজোট সরকারের আমলে দু'মাস দেয়ার পর এক শ্রেণীর আমলার কারণে তা আবার বন্ধ হয়ে যায়। তারা 'যুক্তি' দেখায়, বেসরকারি শিক্ষকদের ক্ষেত্রে টাইম স্কেল প্রযোজ্য নয়। অদ্ভুত যুক্তি! বেসরকারি শিক্ষকদের সরকার থেকে স্কেল দেয়া গেলে টাইম স্কেল দেয়া যাবে না কেন? সেজন্য যে শিক্ষানীতি বর্তমান সরকারের একটা বড় অর্জন, তার বাস্তবায়নে বাজেটে পর্যাপ্ত সংস্থান রাখা কতটা জরুরি তা নীতিনির্ধারকদের বুঝতে হবে।

অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ : [illegible] উন্নয়ন উদ্যোগের চেয়ারম্যান [illegible]
principalqfahmed@yahoo.com